ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

শ্রীচৈতন্য শুধু ভারতপ্রসিদ্ধ এক ধর্মাচার্যই নন, তিনি বিশ্বপ্রসিদ্ধ এক ধর্মান্দোলনের মহান সংগঠক। নতুন এক ধর্মান্দোলনের তিনি প্রবক্তা এবং প্রবর্তক, বঙ্গদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের তিনি নায়ক এবং নতুন এক ইতিহাসের স্রষ্টা। মধ্যযুগের বঙ্গদেশ এবং সন্নিহিত ওড়িশা, বিহার এবং উত্তর ভারতে এক সাংস্কৃতিক রেনেশাঁসের উদ্গাতা শ্রীচৈতন্য । কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে সাধারণ্যে যে-ধারণা প্রচলিত রয়েছে, তা হলো এই : তিনি ছিলেন পৌরুষহীন এক পুরুষ। সারাজীবন তিনি শুধু কান্নাকাটি করেই কাটিয়েছেন। গয়ায় পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করতে যাওয়ার পর থেকে তাঁর মধ্যে অদ্ভুত এক ধর্মোন্মাদনার আবেশ হয় এবং সেইসঙ্গে শুরু হয় তাঁর কান্না। সেই যে কান্নার সূচনা, তা আর কোনদিন বন্ধ হলো না। তাঁর অবশিষ্ট জীবনও শুধু কান্না আর কান্না। কিন্তু প্রামাণিক প্রাচীন চৈতন্য জীবনীগ্রন্থগুলিতে তাঁর যে-চিত্র পাই, তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে দেখি, তিনি ছিলেন পুরুষসিংহ। আকার ও আচরণ উভয় বিচারেই তিনি ছিলেন পৌরুষের সাকার বিগ্রহ। চৈতন্যচরিতামৃতকার্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখছেন :

"চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার।।"

কাটোয়ার কেশবভারতীর আশ্রমে উত্তরচৈতন্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ছয়শ বছর ধরে যে অহোরাত্র সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে তা মৃদঙ্গ সহযোগে হয় না, হয় ঢাক সহযোগে। কীর্তনের সাধারণ মৃদু সুর নয়, তা বীররসের কীর্তন, পৌরুষদীপ্ত পুরুষালী নৃত্য তার বৈশিষ্ট্য । বর্তমান লেখকের তা স্বচক্ষে দর্শনের সুযোগ হয়েছে। প্রচলিত কীর্তনের মৃদু সুর ও মৃদু অঙ্গভঙ্গি থেকে তার পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং দর্শনযোগ্য। প্রচলিত কীর্তনের ভিত্তিতে শ্রীচৈতন্যের আকার ও আচরণ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যের মৃদু স্বভাব ও ভক্তিভাবাপ্লুত ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে যা কিনা প্রকৃত সত্যের বিপরীত।

একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনীকার স্বামী সারদেশানন্দ আসাধারণের ঐরকম ভ্রান্ত ধারণার অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করে তার অসারতা প্রমাণ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন : "সকল কার্যেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, অপরিসীম বুদ্ধি, অপূর্ব চরিত্র, অতুল কর্মদক্ষতা, মহান হৃদয় ও অলৌকিক অধ্যাত্মসম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়।... তাঁহার জীবন বলবীর্যের উৎস, মৃতসঞ্জীবনী সুধা। আমরা এখন নির্বীর্য বলিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে পারি না।"

শেষের বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং আমরা যেন আমাদের নির্বীর্যতার কিছুটা অন্তত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পুরুষসিংহ চৈতন্যদেবের দিকে তাকাই। এবিষয়ে তাঁর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থগুলি এবং সমকালের ঐতিহাসিক পটভূমির কিঞ্চিৎ জ্ঞান আমাদের সাহায্য করবে। সমকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ভূমিতে চৈতন্যদেবের সমুচ্চ অবদানের কিয়দংশ অন্তত আমরা তখন অনুধাবন করতে পারব। দেখব, ভারতবর্ষের, বিশেষত বঙ্গদেশের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাঁর কাছে কী বিপুল পরিমাণে ঋণী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিক কালের অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে তিনি প্রায় উপেক্ষিতই রয়েছেন। তাঁর ভূমিকা ও অবদান নিয়ে কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা বিশেষ চোখে পড়ছে না। ১৯৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর আবির্ভাবের পাঁচশ বর্ষপূর্তি (জন্ম ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি দোলপূর্ণিমার দিন) উপলক্ষ্যে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত নদীয়া জেলায়, তাঁর সম্পর্কে কিছু আলোচনাসভা ও স্মরণিকা-শ্রেণীর কিছু প্রকাশনা হয়েছিল। কিন্তু সেসকলই তাৎক্ষণিক উৎসাহ-উদ্দীপনার ফলশ্রুতি এবং জয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল উৎসাহ-উদ্দীপনা যেন অন্তর্হিত হয়েছে, চৈতন্যদেব সম্পর্কিত সকল সারস্বত প্রয়াসও যেন তেমনি প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

একথা সত্য যে, শ্রীচৈতন্য প্রধানত একজন জগৎপ্রসিদ্ধ ধর্মাচার্য এবং এও সত্য যে, বিশুদ্ধ ধর্ম বা অধ্যাত্মক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের অবদান অপেক্ষাকৃত বহু-আলোচিত। তাই বর্তমানে আমরা তাঁর বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রাণতার আলোচনা থেকে বিরত থেকে ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অন্যতর অবদান নিয়ে কিছু আলোচনা করব। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, চৈতন্য-পরবর্তী কালে তাঁর ধর্মান্দোলনে অনেক আবিলতা প্রবেশ করেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে, তাতে

শ্রীচৈতন্যের কোন ভূমিকা ছিল না। তাঁর দীপ্ত জীবন অধঃপতিত জাতিকে উত্থানের পথ দেখিয়েছিল, জাতি উত্থিতও হয়েছিল, কিন্তু তাঁর অনুগামীরা তাঁর প্রচারিত ধর্মান্দোলনকে তাঁর অবর্তমানে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেননি। তাঁদের অযোগ্যতায় এই বৃহৎ ও মহৎ ধর্মান্দোলন ক্রমে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। পতনের দায়িত্ব তাঁদেরই। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তিকে সমৃদ্ধ করলেও প্রভূত সম্ভাবনাময় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের গণভিত্তিকে সুদৃঢ় করার কোন প্রয়াস করেননি। গৌড়বঙ্গে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বৈষ্ণবধর্মের গণভিত্তিকে সবল করলেও দার্শনিক স্তরে তার কোন প্রভাব পড়েনি। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পরে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে ও পরিকল্পনায় ধর্মের দার্শনিক ভিত্তির সঙ্গে গণভিত্তিও সমান গুরুত্ব লাভ করেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে বৈষ্ণবধর্মের নবযুগ শুরু হয়েছিল। কিন্তু যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে সেই সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

চৈতন্যদেবের পর বঙ্গদেশের সমাজে এসেছিল এক চরম অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের যুগ। হিন্দুধর্ম তখন যথার্থই, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, "ভাতের হাঁড়িতে" আশ্রয় নিয়েছিল। উচ্চবর্ণের হাতে তখন ধর্ম পণ্য-বিশেষে পর্যবসিত হয়েছিল, জাতিভেদের পাপ সমাজকে করে তুলেছিল পঙ্গু এবং আচারসর্বস্বতার নাগপাশ সমাজজীবনের ভিত্তিকে করে তুলেছিল চূড়ান্তভাবে শিথিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মুসলমান রাজপুরুষদের (শ্রীচৈতন্যের জন্মের প্রায় তিনশ বছর আগেই বঙ্গদেশ মুসলমান শাসনাধীনে এসেছে। বঙ্গে তুর্কী বিজয়ের ফলে ইসলাম তখন এদেশের রাজধর্মে পরিণত হয়েছে।) বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা। অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুও আবার মুসলমান শাসকদের অনুগ্রহলাভের জন্য স্বেচ্ছায় তাদের ধর্ম গ্রহণ করছিল। অন্যদিকে ধর্মধ্বজী হিন্দুসমাজপতিরা কথায় কথায় মানুষকে, বিশেষত নিম্নবর্ণের মানুষকে, তাদের দারিদ্র্য ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত করে চলছিল, অথবা তাদের তথাকথিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বিধান দিচ্ছিল যথেচ্ছ অর্থদণ্ডের বা নানা শারীরিক ও সামাজিক নির্যাতনের। গোঁড়া সমাজপতিদের অত্যাচার ও মাত্রাধিক রক্ষণশীলতায় অতিষ্ঠ হয়ে তারা বাধ্য হয়ে দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করতে ছুটছিল নবাগত ইসলামধর্মের সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের ছত্রছায়ায়। এভাবে নিম্নবর্ণের বিরাট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে হিন্দুসমাজের সম্পর্ক শিথিল হয়ে যেতে লাগল। যারা দিবালোকে মানুষকে ধর্ম-বিচ্যুতি ও সামাজিক অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান দান করছিলেন, তাঁরাই আবার ধর্মের নামে রাত্রির অন্ধকারে দেশ জুড়ে বইয়ে দিচ্ছিলেন বীভৎস বামাচারের, নির্লজ্জ যৌনাচারের নির্বাধ কর্দমাক্ত ধারা। সমাজ ও জাতির জীবনে বাস্তবিকই তা ছিল এক চরম অন্ধকার অধ্যায়।

ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর বিরল প্রতিভা, দুর্জয় প্রত্যয় এবং গভীর দিব্য প্রেমের ঐশ্বর্যে তিনি প্রচার করলেন ভারতের তথা ধর্মের সেই পরম মর্মবাণী, তাঁর আগে চণ্ডীদাসও যার উচ্চারণ করেছিলেন : "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" আচারসর্বস্ব মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার দৃঢ় নাগপাশকে ছিন্ন করে উদার প্রেম-ভক্তির যে ধর্মাদর্শ তিনি স্থাপন করলেন তা সমাজের সর্বস্তরের সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষের মহামিলনের মধ্যে, মহাসমন্বয়ের মধ্যে রূপলাভ করল। তিনি শুরু করলেন এক অভিনব ভক্তি-আন্দোলন—দলবদ্ধভাবে হরিনাম সঙ্কীর্তন। সনাতন ধর্মের ইতিহাসে সেই প্রথম সম্মিলিত ও সমবেত উপাসনা প্রবর্তিত হলো। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাতে সকলের ছিল অংশগ্রহণের অবাধ অধিকার। সে যেন এক মহা ধর্মমহোৎসব। বহুদিন পর ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্য এল সমাজে। কীর্তন হয়ে উঠল সেই সাম্য-আন্দোলনের গণসঙ্গীত। তার স্রোতে দেশ ভেসে গেল, ভেসে গেল বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মনুষ্যনির্মিত সকল ব্যবধানের প্রাচীর। হিন্দুসমাজের পতিত ও পদদলিত মানুষেরা, যারা ইসলামের আশ্রয় লাভ করছিল অথবা করার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিল, কঠোর হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং ইসলামের সুলভ সাম্য—এই উভয়কে দূরে রেখে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের পতাকাতলে তারা আবার দলে দলে সনাতন ধর্মে সমবেত হলো।

নীলাচলে যাওয়ার সময় চৈতন্যদেব ছোটনাগপুরের মধ্য দিয়ে পথ পরিক্রমা করেছিলেন। সেই সময় ঐ অঞ্চলের অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের তিনি তাঁর প্রেমধর্মের মন্ত্রে দীক্ষাদান করেছিলেন। এইভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ ও পার্শ্ববর্তী বিহার ও উড়িষার অগণিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে নবজীবনের প্রবল বন্যা এসেছিল। তারাও যে মানুষ, সেই আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা শ্রীচৈতন্য তাদের মধ্যে জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। মনুষ্যত্বের আস্বাদ পেয়ে তারা নববলে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তা ছিল এক প্রবল ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদী বিদ্রোহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সমকালে আরো কয়েকজন সন্ত-সাধকের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাঁরাও নিজ নিজ অঞ্চলে ঐ একই ভূমিকা পালন

করছিলেন। তাঁদের মধ্যে নানক, তুলসীদাস, কবীর, নামদেব, সুরদাস, একনাথ, মীরাবাঈ, দাদূ প্রমূখ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। প্রসঙ্গত, একথাও উল্লেখ্য যে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে হরিনাম-সঙ্কীর্তনের্ প্রবর্তন করে চৈতন্যদেব ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম জনসংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষেই তা ছিল ভারতবর্ষের প্রথম সংগঠিত গণ-আন্দোলন বা 'অরগানাইজড মাস মুভমেন্ট'। মহাত্মা গান্ধীর সুবিখ্যাত 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন বা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পাঁচশো বছর আগেই শ্রীচৈতন্য ধর্মের আহ্বানে সেই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। প্রয়োজনে এই আন্দোলনকে চৈতন্যদেব অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধেও সংগঠিত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাজী-দলনের ঘটনাটি এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করছি।

চৈতন্যদেব এইভাবে সমকালীন হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব আনয়ন করলেন, তাকে তাঁর প্রচারিত নামধর্মের বা প্রেমধর্মের উপজাত বা 'বাই-প্রোডাক্ট' ভাবলে ভুল করা হবে। এই বিপ্লব ছিল একান্তভাবেই তাঁর পরিকল্পিত। প্রখ্যাত চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবনদাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে লিখেছেন, চৈতন্যদেব অঙ্গীকার করেছিলেন : "ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন পরচার।" অপর এক বিশিষ্ট চৈতন্য-জীবনীকার জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ চৈতন্যদেবের জবানীতে লিখেছেন : "জাতিভেদ না করিমু চণ্ডাল যবনে।" তাঁর আন্দোলনের অন্যতম সেনাপতি নিত্যানন্দকে তিনি সাম্যের বার্তা প্রচার করার জন্য গৌড়বঙ্গে প্রেরণ করেন :

"এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও।।
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন।।" ('চৈতন্যভাগবত')

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ শ্রীচৈতন্যের কণ্ঠে আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় শুনি, প্রেমভক্তিলাভের অধিকার জাতি-বর্ণ-উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলের সমান। কারো বিশেষ অধিকার বা অতিরিক্ত যোগ্যতার প্রশ্ন সেখানে নেই :

"নীচ জাতি হইলে নহে ভজনে অযোগ্য,
সৎ কুলে বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।
কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতিকুলাদি বিচার।।"

তিনি তাঁর সাম্যের অভিযানে পূজা ও আচার অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে শুধু 'ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর' হরিনামকে তাঁর মহাবিপ্লবের নতুন মন্ত্র করলেন। " হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।" শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে হয়ে উঠল এক প্রবল শক্তিশালী ধর্মান্দোলনের গণসঙ্গীত।

সাম্যের শাসনে প্রথম প্রতিবন্ধক বিশেষ অধিকার। সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি বেদান্ত কখনো বিশেষ অধিকারকে স্বীকার করেনি। শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রবর্তিত নামধর্ম বা প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের ভিত্তিতে সেই বিশেষ অধিকার বিলোপ শুধু ঘোষণাই করেননি, তিনি বাস্তবে তার অবসান ঘটিয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর নামধর্মের মাধ্যমে অনুদার, সঙ্কীর্ণ, আচার ও প্রথা-সর্বস্ব তৎকালীন হিন্দু ব্রাহ্মণ্যসমাজের অচলায়তনে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করলেন চৈতন্যদেব। কিন্তু সহজে এই কাজ—এত বড় আন্দোলন সঙ্ঘটিত হয়ে যায়নি। চৈতন্যদেবকে অনেক বাধা, অনেক সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একদিকে বিধর্মী রাজশক্তি, অপরদিকে হিন্দুসমাজেরই শীর্ষস্থানীয় কিছু মানুষ, বামাচারী তান্ত্রিকের দল এবং রক্ষণশীল স্মার্ত ব্রাহ্মণগোষ্ঠী কোমর বেঁধে তাঁর বিরোধিতায় নেমেছিল। অবশ্য যারা প্রগতির নায়ক হয়ে আসেন, এ তাঁদের ললাটলিপি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, একই সময়ে ইউরোপে প্রথাসর্বস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন মার্টিন লুথার (জন্ম ১৪৮৪ খ্রীস্টাব্দ)। চৈতন্যদেবের মতো সমকালীন ইউরোপের ধর্ম, সমাজ ও ভাবজগতে তিনিও একটি বিপ্লবের সূত্রপাত করেন। শ্রীচৈতন্যের উদার নামধর্মের পতাকাতলে মিলিত হয়েছিলেন উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-চন্ডাল, হিন্দু-মুসলমান। কণ্ঠে তাঁদের "ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর"। অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।/" কোন অনুশাসন নেই, কোন বিধি-বিধান নেই। শুধু এই মহানাম। এই নামই হয়ে উঠল মানুষের জাগরণের মহামন্ত্র। এমন সহজ ধর্ম, এমন সরল ভগবানলাভের পথ ধর্মের ইতিহাসে এই প্রথম প্রচারিত হলো।

শুধু ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, চৈতন্যদেব সামগ্রিকভাবে তৎকালীন বঙ্গদেশের কৃষ্টিজগৎকেও বিরাটভাবে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। সমকালীন ও পরবর্তী কালের বাংলার ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সঙ্গীত-কৃষ্টি-সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই

তাঁর প্রভা বিকীর্ণ হয়েছিল। প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়—"কানু বিনা গীত নাই।" চৈতন্যোত্তর বঙ্গদেশেও শুধু গীতই নয়, চৈতন্য বা গৌর ভিন্ন কোন কিছুই হয়নি। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাঙলা ও সংস্কৃতে যে বিশাল ধর্ম-সাহিত্য, জীবনী-সাহিত্য, ঐতিহাসিক নিবন্ধ-সাহিত্য ও দর্শন-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তা আমরা জানি। বস্তুত, ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলার সাহিত্য ও দর্শনকে চৈতন্যদেব কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে চলেছেন। সাম্প্রতিককালের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বিমলকৃষ্ণ মতিলাল লিখেছেন : "বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে কিছু পরিচয় না থাকলে ষোড়শ শতক থেকে বাঙলা সাহিত্যের ধারা, গতিপ্রকৃতি একদম বোঝা যাবে না। বিশ্লেষণও করা যাবে না। এমনকি আধুনিক যুগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কবিতার শতকরা ৩০/৪০ ভাগ বৈষ্ণবভাবে ভাবিত—এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। 'ভানু সিংহের পদাবলী' শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।" পদাবলী-কীর্তন তো সম্পূর্ণত এবং বহুসংখ্যক ভজন এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও বৈষ্ণবভাবাশ্রিত, একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া রয়েছে বাউল-সঙ্গীত। গরাণহাটি ও মনোহরসাহী ঠাটের কীর্তন শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত সঙ্গীতজ্ঞ বৈষ্ণব সন্ত-সাধকদেরই সৃষ্টি। এভাবে যখন সাহিত্য ও সঙ্গীত শ্রীচৈতন্য-প্রভাবে সমৃদ্ধি লাভ করছে তখনি পাশাপাশি শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র ও নতুন ধারাও প্রসারলাভ করতে শুরু করেছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলার শিল্প-ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলন তথা বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণার বিষয়টি সুপরিস্ফুট হবে।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পে দক্ষিণী, রাজস্থানী এবং ওড়িশী উপাদানের সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির নেপথ্যে চৈতন্যদেবের পরোক্ষ প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। কারণ, চৈতন্যদেবই দীর্ঘকাল পরে বাঙালীর আপন-গৃহকোণে-সুখী মানসিকতাকে আবার বহির্মুখী করে দিয়েছিলেন। আমরা চৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক ভারত-পরিব্রজ্যার বিষয়টি এখানে স্মরণ করছি। ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর হয়ে থাকলেও শ্রীচৈতন্য কখনো ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটকে বিস্মৃত হননি। পরিব্রাজক শ্রীচৈতন্য গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন। গৌড়বঙ্গের পর উড়িশা। অতঃপর দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট। তারপর তাঁর পরিব্রাজন-সূচীতে অন্তর্ভুক্ত হলো হিন্দু-সংস্কৃতির পীঠস্থান উত্তর-ভারতের মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ এবং বারাণসী। পুরী এবং নবদ্বীপ থেকে বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা বৃন্দাবনের পথে পড়ে মুঙ্গের, পাটনা, আগ্রার মতো শিল্প, সঙ্গীত ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি। এখানে উল্লেখ্য যে, বহুকাল থেকে বাণিজ্যযাত্রাপ্রিয় বাঙালী বণিকদের বহির্বাণিজ্য তখন প্রায় অবলুপ্ত। ফলে আন্তঃপ্রাদেশিক সংযোগও ছিন্ন। চৈতন্যদেবের এই পরিক্রমার ফলে একদিকে পুরী, অপরদিকে বারাণসী, বৃন্দাবন ও মথুরার তীর্থভূমি, দক্ষিণে বিদ্যানগর, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, শ্রীরঙ্গম, কন্যাকুমারী, পশ্চিমে পান্ধারপুর নতুন করে যেন আবার বাঙালীকে আকর্ষণ করল। এর অতিরিক্ত ফল বাঙালীর চিত্তবিকাশ এবং সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন : "বড় প্রচারক্ষেত্র ব্রজধাম ও পথে বারাণসী-প্রয়াগ। ব্রজধামের ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম—মনে রাখতে হবে, মথুরা ও বৃন্দাবন আগ্রা ও দিল্লির কত কাছে। পাঠানসূর্য তখন অস্তমান, মোগলসূর্য সবে উঠছে। এই অবস্থায় হিন্দু রাজন্যবর্গের, বিশেষত জয়পুরের একটা ভূমিকা তাঁর (চৈতন্যদেবের) চোখ এড়ায়নি। বারাণসী তো হিন্দু-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।... দিবোন্মাদে মত্ত হলেও তাঁর চিত্তে ভারতের সাংস্কৃতিক মানচিত্র সদা প্রসারিত থাকত।" এইভাবে শ্রীচৈতন্য পূর্বভারত, দক্ষিণভারত, পশ্চিমভারত ও উত্তরভারতের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক এক সুদৃঢ় ভাববন্ধনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বরূপ দামোদর প্রমুখ পার্ষদ-সহ তিনি নিজে রইলেন পুরীতে, দক্ষিণে রাখলেন রায় রামানন্দকে, গৌড়বঙ্গে নিত্যানন্দকে, বারাণসীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে এবং রূপ, সনাতন প্রমুখ সমকালের ছয়জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও উন্নত সাধককে প্রেরণ করলেন বৃন্দাবনে। বস্তুতপক্ষে তাঁরা ছিলেন তাঁর ভাব-আন্দোলনের একেকজন সেনানায়ক। প্রায় ছয়বছর কাল ধরে তাঁর দেশ-পরিক্রমা ও আন্দোলনকে সুরক্ষিত করার অতন্দ্র প্রয়াসের মধ্যে ছিল তাঁর অসাধারণ ভারতদৃষ্টি। কেউ এর মধ্যে তাঁর সুগভীর রাষ্ট্রনৈতিক প্রজ্ঞার প্রকাশও দেখতে পারেন। জীবনের শেষ আঠার বছর তিনি পুরীকেই তাঁর অধিষ্ঠানক্ষেত্র করেছিলেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পুরী ছিল সমকালীন ভারতবর্ষে উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের অন্যতম প্রধান সঙ্গমস্থল। ভারত-পরিক্রমার পর সেই সঙ্গমস্থলে দীর্ঘকাল অবস্থান করে তিনি যখন মহাপ্রয়াণ করলেন, তখন তিনি বাস্তবিকই হয়ে উঠেছেন 'ভারতপথিক শ্রীচৈতন্য'।

শ্রীচৈতন্যের অসাধারণ ভারতদৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে তাঁর সুগভীর সমন্বয়-দৃষ্টি। ভারত-পরিক্রমার সুদীর্ঘ পথে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, কৌমার প্রভৃতি হিন্দুসমাজের নানা সম্প্রদায়ের বিগ্রহ ও মন্দিরাদি তিনি পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দর্শন করেছেন, প্রণত হয়েছেন এবং সর্বত্রই তিনি তাঁর ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ উপলব্ধি করেছেন। সব পথই যে একই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে, সকলেই যে সেই এক-কেই ডাকছেন তা তাঁর আচরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হতো। কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখেছেন :

"মহানুভবের হয় এই তো লক্ষণ
সর্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্ট দরশন।।
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্তি।
সর্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি।।"

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের তিনশ বছর পর বঙ্গদেশেই আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যের সার্থক উত্তরসুরী সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ। ভারতপথিক শ্রীচৈতন্য যে সর্বভাবেই বিশ্বপথিক শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ পূর্বসূরী ছিলেন, শ্রীচৈতন্যের সুগভীর সমন্বয়দৃষ্টি থেকে তা প্রমাণিত।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ) পর এত দীর্ঘকালের ব্যবধানে শ্রীচৈতন্য কোন্ বিরাট অবদান রেখেছিলেন তা হয়তো হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। কিন্তু সময়ের ধূলি সরিয়ে ইতিহাসের শ্রীচৈতন্যের যে-চিত্রটি এতক্ষণ আমরা প্রত্যক্ষ করছিলাম, তা কিন্তু কম উজ্জ্বল নয়। শ্রীচৈতন্য যে সঙ্কীর্তনকে তাঁর ধর্মান্দোলনের মন্ত্র করেছিলেন তা যে নিস্তেজ হয়ে যায় নি, সময়ের স্রোতে হারিয়ে যায় নি, তার প্রমাণ শুধু ভারত জুড়ে নয়, বিশ্বজুড়ে এখন পাওয়া যাচ্ছে। সারা পৃথিবীর দেশে দেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কীর্তন আবার নতুন শক্তিতে প্রবল হয়ে উঠছে। সেই প্রবলতার মধ্যে আবেগ ও ভাবালুতার মিশ্রণ কতখানি তা পরবর্তীকালের ইতিহাসবিদগণের বিচার্য, কিন্তু তা যে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে নতুন করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। তবে শ্রীচৈতন্যের বিশুদ্ধ ধর্মচেতনা যদি তাকে আশ্রয় করে থাকে তাহলে তা যে পৃথিবীর নতুন আশ্রয় হয়ে উঠবে তা অবশ্যই বলা যায়। চৈতন্যদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি জগৎকে ঈশ্বরপ্রেমের বিশুদ্ধতম মার্গদর্শন। প্রসঙ্গটির আলোচনায় আমরা এখানে যাইনি, তবুও তাঁর অন্যান্য ঐতিহাসিক অবদানের সঙ্গে একথা আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে, তিনি মধ্যযুগের ইতিহাসের সর্বাগ্রগণ্য সন্তপুরুষ, যিনি ভারতবর্ষে ধর্মকে জীবন থেকে বিচ্যুত করে দেখেননি। তিনি ভগবানকে আমাদের ঘরের মানুষ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। ধর্মকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ করে তাকে জীবনের অঙ্গ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন ঈশ্বরপ্রাণতা কত গভীর হতে পারে। এই কীর্তি শুদ্ধ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত কিনা বলতে পারি না, তবে এ যে বিশুদ্ধ ইতিহাসের মহত্তম অঙ্গ সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।